

कं(४८)

बो
५

कृष्ण
कृष्णाक्षी



पुष्पाक्षरी

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্তার নূতন শিক্ষা-ধারা অনুসারে বিদ্যালয়সমূহের
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপপাঠ্যরূপে লিখিত।



পদ্মিনী, কৃষ্ণকুমারী, গীরাবাস্তি, রাজ্যশ্রী, গার্গী, অরুন্ধতী, কৰ্ম্মদেবী প্রভৃতি প্রণেত্রী

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া

প্রকাশ করেছেন—

শ্রীমুখোদচন্দ্র মজুমদার

দেব-সাহিত্য-কুটির

২২।৫বি, বামাপুকুর লেন.

কলিকাতা—৯

২৫ ব্রীচদণ্ড নতুন দিল্লী

৫৮ নতুন দিল্লী

৫৮ নতুন দিল্লী

পুনর্মুদ্রণ—

দোল-পুর্ণিমা

১৩৬০

ছেপেছেন—

এস. সি. মজুমদার

দেব প্রেস

২৪, বামাপুকুর লেন

কলিকাতা—৯

দাম—

ছয় আনা

ପ୍ରିତି-ସୂତି



কৃষ্ণকুমারী

এক

রাজপুতানায় পাহাড়-ঘেরা মেবার রাজ্য। উদয়পুর তার রাজধানী। একদিন এই উদয়পুরের রাণাদের ক্ষমতায় পাঠান ও মোগল-সম্রাটেরা ভয়ে কাঁপতো,—দিল্লীর সিংহাসন টলমল করতো। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন উদয়পুরের আর সে ক্ষমতা ছিল না। বহু যুদ্ধে, বহু রক্তপাতে উদয়পুরের রাণা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। রাজ্যও আর আগের মত বড় ছিল না।

উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহ।—কৃষ্ণকুমারী তাঁর মেয়ে। কৃষ্ণকুমারীকে আদর করে সবাই ডাকতো, “কৃষ্ণা”।

কৃষ্ণা পরমা-সুন্দরী। তাঁর মত সুন্দরী তখন সারা ভারতবর্ষে কেউ ছিল না। রূপের জন্য লোকে তাঁকে “রাজপুতানার শ্লপদ্বিনী” বলতো। যারা তাঁকে দেখেছে তারা বলতো, স্বর্গ থেকে ভুল করে কোন্ দেব-কন্যাকে ভগবান পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন!

ফুলের গন্ধ যেমন চারদিকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, কৃষ্ণকুমারীর রূপের কথাও লোকের মুখে মুখে তেমনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

ভীমসিংহের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু তিনি সব চেয়ে বেশী ভালবাসতেন এই কৃষ্ণাকে। কৃষ্ণা যেন তাঁর প্রাণের চেয়েও বেশী!

কৃষ্ণার সুন্দর ঢলঢলে মুখখানা এক দণ্ড না দেখলে বুড়ো রাজা যেন হাঁপিয়ে উঠতেন, রাজকার্য্য তাঁর ভাল লাগতো না, চারদিকের শোভা-সৌন্দর্য্য যেন তাঁর চোখে ভীষণ ঠেকতো ! তারপর যেমন কৃষ্ণা তাঁর আঙুরের খোকার মত গোছা গোছা ঢুলগুলো ছলিয়ে টাঁদের জোছনার মত হাসিমুখে এসে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তো, রাণার তখন মনে হ'তো এই বুঝি স্বর্ণ, এমন আনন্দের চেয়ে সেরা আনন্দ বুঝি আর কোথাও নেই ! তিনি ছ'হাতে আদরিণী মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে কত সুখের স্বপ্ন দেখতেন ! কিন্তু হয়, তিনি বুঝি জানতেন না যে, মানুষ গড়ে—আর ভগবান্ ভাঙ্গেন !

দুই

কৃষ্ণার বিয়ের বয়স হ'লো ।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপ আরও বেড়ে উঠলো । যেন চিত্রকরের বহু যত্নে তুলি-ধ'রে-আঁকা একখানি ছবি !

এমন মেয়ের বিয়ের জন্য বর খুঁজতে রাণাকে আর বেশী কষ্ট পেতে হ'লো না । কত রাজা, কত রাজপুত্র কৃষ্ণাকে পা'বার জন্য লালায়িত !

অবশেষে মারবারের রাজার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়ে গেল । কিন্তু বিয়ে আর হ'তে পারলো না । কয়েকদিন পরেই মারবারের রাজার মৃত্যু হলো ।

জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ । রাণা ভীমসিংহ তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণার

বিবাহ ঠিক করলেন। বিয়ের দিন অবধি ঠিক হ'য়ে পাকা দেখা হ'য়ে গেল।

সখীরা এসে ফুল দিয়ে কৃষ্ণাকে ফুল-রাণী সাজিয়ে বখ্শিস্ চাইলো। কৃষ্ণা মুচকি হেসে চোখের ইসারায় যেন জানিয়ে দিলেন,— ‘হবে লো হবে!’ হাসি-গান গল্পগুজবে সখীরা কৃষ্ণাকে সর্বক্ষণ মাতিয়ে রাখলো। কৃষ্ণারও মনের গোপনপুরে আশা ও আনন্দের কত কি লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হ'লো!

উদয়পুরে উৎসবের আয়োজন চলতে লাগলো। নহবতে নহবতে বাঁশী বেজে উঠলো। রাজকুমারীর বিয়ে,—প্রজাদের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না!

ঝুড়ো রাজা-রাণীর মনে কিন্তু সুখ নাই, অত আদরের কৃষ্ণা তাঁদের, তাকে ছ'দিন পরেই পর ক'রে দিতে হবে। উদয়পুরের রাজ-ভবন কৃষ্ণাবিহনে রুঝি অন্ধকার হ'য়ে যাবে!

জগৎসিংহ তিন হাজার সৈন্য দিয়ে কৃষ্ণকুমারীর জন্য কত রকম কাপড়-চোপড় ও অলঙ্কার উদয়পুরে পাঠালেন। ভীমসিংহও জামাইকে উপযুক্ত মত যৌতুক দিলেন। এই যৌতুক দেওয়া-নেওয়া ব্যাপার নিয়ে জয়পুরের সৈন্যদের কিছু বেশীদিন উদয়পুরে থাকতে হ'লো। উদয়পুরের একটু দূরে তাদের তাঁরু পড়েছিল।

বিয়ের আর বেশীদিন বাকী নেই। ছই রাজ্যই বিয়ের আমোদে খুব মেতে উঠেছে। এমনি সময় মারবারের নূতন রাজা মানসিংহের দরবার থেকে এক দূত এসে উদয়পুরে উপস্থিত।

মানসিংহ লিখেছেন, এর আগে মারবারের রাজার সঙ্গে কৃষ্ণার সম্বন্ধ হ'য়েছিল; সে রাজা ম'রে যাওয়ায় এখন তিনি হয়েছেন

মারবারের রাজা, কাজেই তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিয়ে দিতে হবে। যদি না দেন, তবে যে আগুন জ্ব'লে উঠবে তা' থেকে উদয়পুরকে বাঁচানো শক্ত হবে।

রাজসভায় ব'সেই রাজা মানসিংহের পত্রখানা রাণী ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দূতের সম্মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন,—“যাও দূত, তোমার প্রভুকে ব'লো—তার এই উম্মাদের মত যুক্তি শু'নে মেবারের সামান্য প্রজা পর্যন্ত হো-হো ক'রে হেসে উঠেছে। আর শোন দূত, তোমার প্রভুকে ব'লো, ভীমসিংহ বৃদ্ধ হ'য়েছে ব'লে এখনো মনের বল হারায়নি—যে, একটা অল্পবুদ্ধি যুবকের অগ্নায় আদেশ সে ভয়ে ভয়ে পালন করবে।”

কথাটা কৃষ্ণার কাণে উঠতেও বাকী রইলো না। শু'নে তিনি শুধু মুচকি হাসলেন।

তিনি তাঁর আদরের পাখী পদ্মাকে নিয়ে ব'সে গুন্ গুন্ ক'রে গান গাইছিলেন, এমন সময় সখী নন্দা হেসে হেসে ছলতে ছলতে এসে গানের স্বরে বলে—“এবার যে ভাই ভাগাভাগি, আধা জয়পুরে আধা মারবারে!”.....

কৃষ্ণা হাসি চাপতে চাপতে গম্ভীর হ'য়ে বলেন, “রাজা মানসিংহ তাঁর শাস্য অধিকার দাবী করেছেন, এতে তোরা দোষের কি দেখছিস? একসঙ্গে ছ'টো রাজ্যের রাণী হওয়া, এমন সৌভাগ্য ক'জনের অদৃষ্টে ঘটে বলতো?”

এই ব'লে তিনি গান ধরলেন :—

“আয়রে ও ভাই মলয় সমীর,

উড়িয়ে তোর সবুজ পাখা।

ফুলের গায়ে পরশ লাগুক,
কুঁড়িগুলি মুচকে হানুক,
শিউরে উঠুক বনে বনে,
লতায় লতায় নৃতন শাখা ॥”

তিন

গোয়ালিয়রের রাজা সিন্ধিয়া জগৎসিংহের কাছে অনায়মত কিছু টাকার দাবী করেছিলেন। কিন্তু জগৎসিংহ সে টাকা দেননি। সিন্ধিয়া এইবার সুবিধা পেয়ে জগৎসিংহের উপর প্রতিশোধ নিতে উঠে পড়ে লাগলেন। যাঁতে জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিয়ে না হ’য়ে মানসিংহের সঙ্গে হয়, এই জয় তিনি গিয়ে মানসিংহের পক্ষে যোগ দিলেন।

সিন্ধিয়ার তখন প্রচণ্ড ক্ষমতা। সবাই তাঁকে ভয় করতো। তিনি ভীমসিংহকে লিখলেন—“এক্ষুণি জগৎসিংহের সৈন্য উদয়পুর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মানসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিয়ে দাও। তা না হ’লে আমি গোলাগুলি নিয়ে তোমায় শিক্ষা দিতে যাচ্ছি।”

সিন্ধিয়ার সে ধমকানোতে ভীমসিংহ ভয় পেলেন না। জগৎসিংহের সঙ্গেই তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন,—এই তাঁর পণ।

রাণা ভীমসিংহের সর্দারদের মধ্যে ছ’টো দল ছিল,—একদল চন্দাবৎ, আর একদল রাঠোর। এই ছ’দলের মধ্যে মোটেই মনের মিল

ছিল না। চন্দাবতেরা ছিল রাণার প্রিয়পাত্র, রাঠোরেরা স্মরণ পেলো এই জন্যে গোপনে গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। এবার তারাও প্রতিশোধ নেবার বেশ একটা সুবিধা পেলো। রাণা যাতে কৃষ্ণকুমারীকে জগৎসিংহের হস্ত সমর্পণ না করেন, তারা এজন্য প্রাণপণে চক্রান্ত করতে লাগলো। তাদের এই চক্রান্তের নেতা হ'লো অজিতসিংহ নামে একজন রাঠোর সর্দার।

সিন্ধিয়া প্রকাণ্ড একদল সৈন্য নিয়ে উদয়পুরে এসে হাজির। ভীমসিংহও সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন। দুই দলে খুব যুদ্ধ হ'লো। রাঠোরদের চক্রান্তে ভীমসিংহ হেরে উদয়পুরে পালিয়ে এলেন। সিন্ধিয়াও তাঁকে তাড়া ক'রে পিছু পিছু এসে উদয়পুর আক্রমণ করলেন।

কৃষ্ণার প্রাণের আনন্দ শুকিয়ে গেল। পিতার দুর্দশা দেখে চোখের জলে তাঁর রুক ভাসতে লাগলো। হায়, কত বড় অভাগিনী তিনি! তাঁর জন্মই ত আজ তাঁর পিতার এ দুর্গতি!

সখীরা তাঁকে কত ক'রে বুঝাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সখীরা তাঁকে যতই বুঝায়, কৃষ্ণা ততই কেঁদে আকুল হন, আর সখীদের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলেন,—“তোরা বাবাকে বলগে, সখি, বিয়েতে আমার কাজ নেই, জয়পুরের সৈন্য জয়পুরে ফিরে যা'ক।”

সখীরা মুচকি হেসে বলে, “তাহ'লে জগৎসিংহের কপাল পড়লো, আর মানসিংহের গলে বরণ-মালা.....”

কৃষ্ণকুমারী ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে বলেন, “ছি!”

এইবারে ভীমসিংহ মহা বিপদে পড়লেন। তাঁর রাজ্যপাট সবই যায় আর কি! জগৎসিংহকে মেয়ে দিলে সিন্ধিয়াকে রাজ্য দিতে হয়। আর রাজ্য বাঁচাতে হ'লে মানসিংহের সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়। রাজ্যের

সর্দারের সঙ্গে তিনি পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন, জগৎসিংহের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কাজ নেই, সিন্ধিয়াকে সন্তুষ্ট ক'রে রাজ্য বাঁচাতে হবে।

জগৎসিংহের সৈন্যরা উদয়পুর থেকে চ'লে গেল। তাঁর এত দিনের আশা-ভরসা সব শেষ হ'লো।

এই অপমানের জন্য তাঁর যেমন রাগ হ'লো ভীমসিংহের উপর, তেমনি রাগ হ'লো মানসিংহের উপর। মানসিংহ তাঁর এত আশার মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন অত সহজে! তা' হবে না।

জগৎসিংহ সেনাপতিকে আদেশ করলেন—“সৈন্য সাজাও, এক সঙ্গে মেবার এবং জয়পুরকে এ অপমানের শাস্তি দিতে হবে।”

চান্দ

অনেক দিন অনেকবার অনেক জায়গায় যুদ্ধ হ'লো। কখনো মানসিংহ, কখনো বা জগৎসিংহ হারতে লাগলেন। ভীমসিংহেরও যথেষ্ট ক্ষতি হ'তে লাগলো, তা' ছাড়া অশান্তি-ত আছেই।

তিনি মুখে বলছেন বটে, জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিয়ে দেবেন না। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করছেন, বাগ্দত্তা মেয়েকে কি ক'রে আবার তিনি অন্যের সঙ্গে বিয়ে দেবেন?—আর কৃষ্ণাও তাতে রাজি হবেন না।

অজিৎসিংহ রাণা ভীমসিংহের একজন সর্দার। রাণা সকল ব্যাপারেই তার পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। উঠতে বসতে সে তাঁর

দক্ষিণ হাত। এই সময় অজিত আমীর খাঁ নামে এক পাঠানকে উদয়পুর রাজ-দরবারে এনে স্থান দিল।

আমীর খাঁ টেকের নবাব, কিন্তু তাকে দম্য বলেই হয়। এমন পাপ কাজ নাই যা' আমীর খাঁর দ্বারা হয়নি। সে আবার মানসিংহের বন্ধু।

রাণা ভীমসিংহ, অজিতসিংহ এবং আমীর খাঁর হাতে কলের পুতুলের মত হ'য়ে পড়লেন।

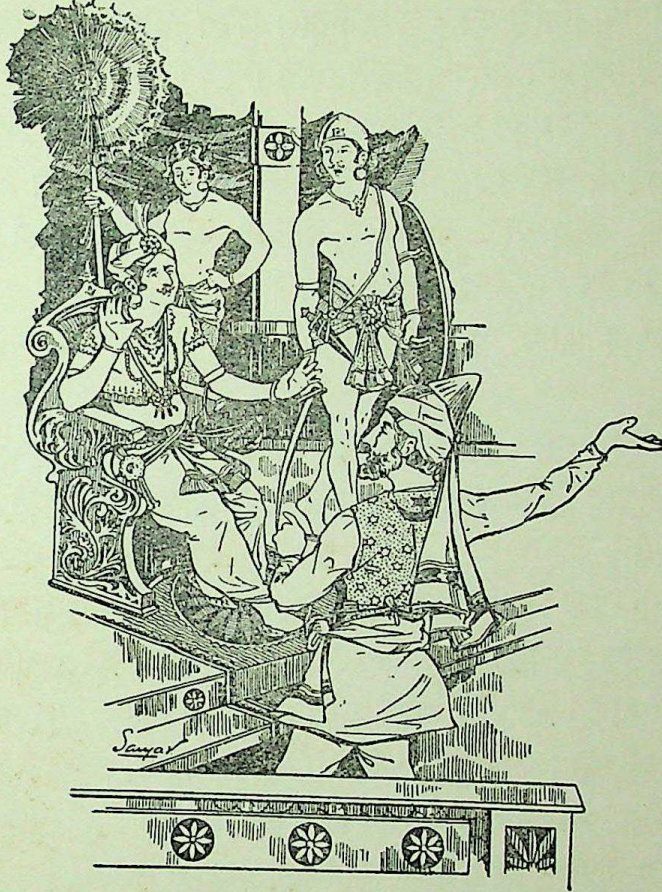
যুদ্ধের আগুন আর নিভছে না। চারদিকেই অশান্তি! পাপিষ্ঠ আমীর খাঁ রাণাকে পরামর্শ দিল,—“যদি রাজ্যের মঙ্গল চান, তবে কৃষ্ণকুমারীর জীবন শেষ ক'রে দিন, তা না হ'লে উদয়পুর ছারখার হ'য়ে যাবে।”

আমীর খাঁর কথা শুনে রাণা শিউরে উঠলেন, তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে দর্দদ্ ক'রে ঘাম ছুটলো। কি সর্বনাশের কথা! যে কৃষ্ণা তাঁর প্রাণের আনন্দ, জীবনের সুখ, পরম হৃৎখেও অগাধ শান্তি, যার মুখ তাঁকে সমস্ত ব্যথা ভুলিয়ে দেয়, রাজ্যের জয় তার প্রাণ নিতে হবে?

পিতা মহা হুশিড়ায় পড়লেন, এক দিকে রাজ্য, অন্যদিকে বড় আদরের তাঁর কৃষ্ণার জীবন।

রাণা আমীর খাঁর উপর রোগে ব'লে উঠলেন, “এই কি তোমার বন্ধুত্ব আমীর খাঁ? বন্ধু হ'য়ে তুমি আমার বড় আদরের কৃষ্ণাকে বলি দিতে বলছো? মেয়ের মুখ হয়ত কখনো দেখনি তুমি! জানো না মেয়ে পিতার বুকের কতখানি জায়গা জুড়ে থাকে! যদি কন্য়ার পিতা হ'তে, যদি বুঝতে পিতৃস্নেহ কি জিনিষ, তা হলে এমন

কথা মুখে আনতে না।...আমি বুঝতে পাচ্ছি নে আমীর খাঁ, একথা উদ্ধারণ করবার আগে তোমার জিভ অসাড় হ'য়ে গেল না কেন?"



আমীর খাঁর কথা শুনে রাণা শিউরে উঠলেন। —১২ পৃষ্ঠা

আমীর খাঁ পাপিষ্ঠ। রাণার কথা তার প্রাণকে এতটুকু স্পর্শ করলো না। সে উচ্ছ্বাসে দরবার কল্পিত ক'রে বলে, “হাঁ মহারাণা, আজ কন্যার বুকের রক্ত দিয়েই উদয়পুরের সিংহাসন বাঁচাতে হবে।

একটা মেয়ের চাইতে একটা রাজ্যের,—একটা সিংহাসনের দাম অনেক বেশী !”

রাণা ভীমসিংহ আর সিংহাসনে ব’সে থাকতে পারলেন না । পাগলের মত টলতে টলতে দরবার ছেড়ে চ’লে গেলেন ।

বিষম ছুঁড়াবনায় ভীমসিংহের কয়েকদিন অতিবাহিত হ’লো । একদিকে প্রাণের চেয়ে প্রিয়তমা কন্যা কৃষ্ণার জীবন, আর একদিকে পিতৃ-পুরুষের রাজ্যের কল্যাণ । কোন্টা রেখে কোন্টা বিসর্জন দেবেন, কিছুই স্থির করতে পারলেন না ।

অবশেষে রাণা কর্তব্য নির্ধারণের জন্য এক সভা আহ্বান করলেন ।

অতি গোপনীয় সেই পরামর্শ । রাজ্যের প্রধান প্রধান কয়েকজন সামন্ত এবং সর্দার নিয়ে অন্তঃপুরের এক অতি নিভৃত প্রকোষ্ঠে পরামর্শ-সভা বসলো ।

অনেক তর্ক-বিতর্ক অনেক আলোচনার পর স্থির হ’লো,—একজন নারীর জীবনের চেয়ে একটা রাজ্যের মূল্য ঢের বেশী, রাজকন্যার জীবন ত তুচ্ছ কথা, রাজার জীবন দিয়েও রাজ্যের মঙ্গল-সাধন করা কর্তব্য ।

রাজ-কর্তব্যের কাছে পিতৃস্নেহ পরাস্ত হ’লো । এ ক্ষেত্রে রাণা পরাস্ত হ’লেন, পাপিষ্ঠ অগ্নির খাঁ জয়লাভ করলো ।

সঙ্গে সঙ্গে রাণার স্বীয় কুল-মর্যাদার কথাও স্মরণ হ’লো ;—বাগ্‌দত্তা কন্যাকে অন্যের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে তার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ।

রাজস্থানের ‘শূল-কমলিনী’র জীবন-প্রদীপ নির্বাপনের আয়োজন চলতে লাগলো ।

এখন প্রশ্ন হলো,—এমন লোক কে আছে, যার প্রাণ একটুও কাঁদবে না,—হাত একটুও কাঁপবে না,—কক্ষার বুকে ছোঁরা বসিয়ে দিতে ?

রাজা দৌলতসিংহের উপর হুকুম হ'লো । তিনি রাণার একজন আত্মীয় ।

হুকুম শুনেই দৌলতসিংহ রাগে ঘৃণায় লাফিয়ে উঠলেন । মুখ দিয়ে তাঁর আগুন ছুটেতে লাগলো । তিনি চীৎকার ক'রে সভাস্থল কাঁপিয়ে বলতে লাগলেন—“যে জিহ্বা এমন নৃশংস কথা উচ্চারণ করতে পারে, শত ধিক্ সে জিহ্বাকে ! মহারাজ, যদি এমন নিষ্ঠুর কাজ ক'রে রাজভক্তির পরিচয় দিতে হয়, তবে চাই না আমি সে রাজভক্তি । সে রাজভক্তি রসাতলে যা'ক্ ।” এই বলতে বলতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজসভা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন ।

রাজা যুবনদাস কৃষ্ণকুমারীর বৈমাত্রেয় ভাই । রাণা ভীমসিংহ এই পাপ কাজের জন্য অবশেষে তাঁকেই হুকুম করলেন । কিন্তু যুবনদাস শত হ'লেও মানুষ ত ! ভাই হ'য়ে তিনি কেমন ক'রে বোনের বুকে ছুরি বসিয়ে দেবেন ? যুবনদাস মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন ।

ভীমসিংহ বললেন,—“যুবনদাস, সবাই বলছে, কক্ষার জীবন বলি না দিলে বাপ-পিতামহের এ রাজ্য ছারখার হ'য়ে যাবে । যাও বাছা, আর ভাববার সময় নেই ।”

যুবনদাস ছোঁরা তুলে নিয়ে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে গেলেন ।

কৃষ্ণা খিড়কির বাগানে লতা-কুঞ্জে ব'সে সখীদের নিয়ে হাসি তামাসা গান ও গল্পে মগ্নে আছেন। এমন সময় যুবনদাস ছোঁরা হাতে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাতালের মত চোখ তাঁর লাল। গা দিয়ে ঘাম ছুটছে। সমস্ত মুখখানা দেখতে কি ভয়ঙ্কর! সারা দেহ তাঁর ঘন ঘন কেঁপে উঠছে।

তাঁকে ঐ ভাবে দেখতে পেয়ে কৃষ্ণার প্রাণ কেঁপে উঠলো, সখীরা ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করলেন, “এ কি দাদা, কি হয়েছে তোমার?”

যুবনদাস বললেন, “বাবার হুকুম বোন, তোমায় মেরে ফেলতে হবে, তা না হ'লে রাজ্য যায়। আর সে ভার পড়েছে তোমার এই পাপিষ্ঠ দাদার উপর। তাই এসেছি আমি।”

কৃষ্ণা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনলেন। মুখে ভয়ের একটু চিহ্নও দেখা গেল না। তিনি ধীর শান্ত ভাবে বললেন “সে জন্ম ভয় কি দাদা? আমার এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে যদি রাজ্যরক্ষা হয়, সে ত আমার পরম সৌভাগ্য!”—এই ব'লে কৃষ্ণা হাসিমুখে এসে যুবনদাসের স্মুখে দাঁড়িয়ে বুক পেতে দিলেন।

বোনের মুখ দেখে যুবনদাসের হাত থেকে ছোঁরা খ'সে মাটিতে প'ড়ে গেল। যুবনদাস পাগলের মত ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

সখীরা ব্যাপার দেখে অবাক! চারদিক্ তখনো বিবাহের উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা, তার মধ্যে হঠাৎ একি বীভৎস ব্যাপার!

কৃষ্ণকুমারীর মুখে কোনো চাঞ্চল্য বা ভয়ের চিহ্ন নাই। আগের

মতই তিনি স্থির ধীর ! সখীদের আশ্বস্ত ক'রে তিনি বলেন, “রাজ্যের
মঙ্গলের জন্য হয়ত রাজলক্ষ্মী আমার রক্ত চেয়েছেন, তাই এই



“এ কি দাদা, কি হয়েছে তোমার ?” —১৬ পৃষ্ঠা।

আয়োজন ! সে জন্য ভয়ের ত কিছু নেই। আমার জীবন দিয়ে
যদি রাজ্যের মঙ্গল হয়, তবে তার চাইতে আর আমার জীবনের বেশী
গৌরব কি হ'তে পারে সখী ?”



পুরুষদের দিয়ে যখন সে নিষ্ঠুর কার্য সাধিত হ'লো না, সে
অপরূপ অনিন্দ্য সৌন্দর্যের স্বমুখে দাঁড়িয়ে সেই সৌন্দর্য ধ্বংস করবার
প্রবৃত্তি যখন কোনো পুরুষ দ্বারা সম্ভব হ'লো না, তখন স্থির হ'লো,—
কৃষ্ণার জীবন-নাশের জন্য এবার নারী নিযুক্ত করতে হবে ; কিন্তু
নারীরও হয়ত প্রবৃত্তি হবে না অমন সুন্দরীর বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিতে,
তাই বিষদানে কৃষ্ণার প্রাণবিনাশের ব্যবস্থা হ'লো ।

বিষ তৈরী ক'রে এক রাক্ষসী দাসীর হাতে দেওয়া হ'লো । সে

বিষের বাটি হাতে কৃষ্ণার কাছে গিয়ে রাণার হকুম তাঁকে জানিয়ে দিলে।

সমস্ত রাজবাড়ীতে তখন এ সংবাদ রটে গেছে। কৃষ্ণকুমারীর মা'র কারার রোলে আকাশ ফেটে যাচ্ছে। তিনি মেয়েকে কোলে নিয়ে ব'সে আছেন, যেন মরণের মুখ থেকে তাকে কেড়ে আনবেন!

কৃষ্ণা মাকে সাঙ্কনা দিয়ে বুঝিয়ে বললেন,—“মা, আমি রাজপুতের মেয়ে, মরণ ত আমার খেলার জিনিষ মা, এজন্য তুমি শোকে আকুল হচ্ছে কেন? কত শতশত রাজপুতের মেয়ে দেশের জন্ম প্রাণ দিয়েছে, তা'ত তুমি জান মা! আজ মরতে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। আমার এই সামান্য প্রাণটা দিয়ে রাজ্যের কত বড় একটা উপকার হবে ভাব দেখি! রাজপুতের মেয়ে হ'য়ে আমি এ গৌরব চাইবো না কেন? তুমি এতে বাধা দিও না মা!”

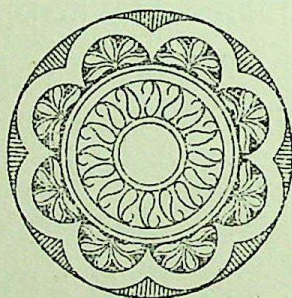
কৃষ্ণকুমারী দাসীর হাত থেকে বিষের বাটিটা নিয়ে ঢুক ঢুক ক'রে সবটুকু একেবারে গিলে ফেলেন। তাঁর মা এ কাণ্ড দেখতে পারলেন না, সেইখানে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলেন!

বিষ খেয়ে কৃষ্ণার কিছুই হ'লো না। তিনি যেমন হাসছিলেন, যেমন কথা কইছিলেন, তেমনি হাসতে ও কথা কইতে লাগলেন। আবার এক বাটি বিষ তাঁকে দেওয়া হ'লো। সেটুকুও কৃষ্ণা খেয়ে ফেলেন! তবু কিছুই হ'লো না! আবার এক বাটি দেওয়া হ'লো। কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণা অনায়াসে সেটুকুও খেয়ে ফেলে তেমনি ব'সে রইলেন! তাঁর মুখ-চোখের অবধি একটু পরিবর্তন হ'লো না! যেন মৃত্যুর সঙ্গে কৃষ্ণার রীতিমত খেলা চলছে, তিনি মৃত্যুকে ধ'রে তার কোলে মাথা রেখে আরামে ঘুমুতে চান, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে ধরা দিতে

রাজী নয়! বার বার কৃষ্ণা ঢক্ ঢক্ ক'রে অমন দারুণ বিষগুলো গিলে ফেলছেন দেখে সবাই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। কেউ বলছে, কৃষ্ণা মেবার রাজ্যের লক্ষ্মী, ভগবান্ তাঁকে রক্ষা করছেন।

শত্রুরা বলছে,—কৃষ্ণা ডাইনী, ওকে মারতেই হবে, তা না হ'লে রাজ্যের মঙ্গল নেই।

কৃষ্ণা নীরব, মুখে তাঁর একটু বিষাদের চিহ্নও নেই! মৃত্যুই যেন তাঁর বড় আদরের, জীবন তিনি চান না!



আতি

ভীষ্মসিংহকে সবাই বলতে লাগলো,—“মহারাণা ! ভগবান্ কৃষ্ণার অপমৃত্যু লেখেননি ! কেন অনর্থক ওকে কষ্ট দিচ্ছেন ?”

এই কথা শুনে রাণার প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হ’য়ে উঠলো,— তা’ হ’লে বুঝি প্রাণাধিকা কন্যার শোকের আগুনে তাঁকে দগ্ধ হ’তে হবে না ।

অজিতসিংহ এবং আমীর খাঁ নীরবে ব’সে আছে । তাদের মুখে হিংস্র পশুর ভীষণ দ্রুটি, কিন্তু মুখে একটিও কথা নাই ।

রাণা একবার অজিতের মুখের দিকে, একবার আমীর খাঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন । তিনি তাদের হাতে এম্‌নি খেলার পুতুল হ’য়ে পড়েছেন, আর তাদের এতই ভয় করেন যে, তাদের ইচ্ছার উপরেই সব নির্ভর করছে ।

অজিত উত্তর করলে,—“যদি রাজ্যের মঙ্গল দেখতে হয়, তবে রাজকুমারীর জীবনের মায়া করলে চলবে না ।”

আমীর খাঁ অজিতের বন্ধু এবং তার একেবারে হাতধরা লোক ।

সে দাঁড়িয়ে ব’লে উঠলো, “বেশ, তোমরা কৃষ্ণাকে বাঁচাতে চাও, বাঁচাও ; কিন্তু কালই আমি উদয়পুর উচ্ছন্ন দেবো ।”

সবাই নীরবে মাথা নীচু ক'রে বসে রইলো। কারো সাহস
হ'লো না, দ্বিতীয় কথাটি বলে।



“কালই আমি উদয়পুর উচ্ছন্ন দেবো।” —২১ পৃষ্ঠা।

হতভাগিনী কৃষ্ণাকে তাহ'লে মরতেই হবে! কে তাঁকে রক্ষা
করবে?

এবার এক অতি ভীষণ বিষ তৈরী হ'লো ।

কৃষ্ণা বুঝলেন, এবার আর তাঁর রক্ষা নাই । তিনি উদ্বেগে ভগবানের দিকে তাকিয়ে হাত ষোড় ক'রে বলেন, “ভগবান্ !



আমার এ তুচ্ছ জীবন দিয়ে পিতার এবং তাঁর রাজ্যের যেন মঙ্গল হয় ।” তারপর বিষের বাটিতে ঢুক দিলেন ।

একটু পরেই গোলাপের পাপড়ির মত কৃষ্ণার সুন্দর মুখখানি ছাই-এর মত পাঁশুটে হ'য়ে এলো । সমস্ত শরীর থর্-থর্ করে কাপতে

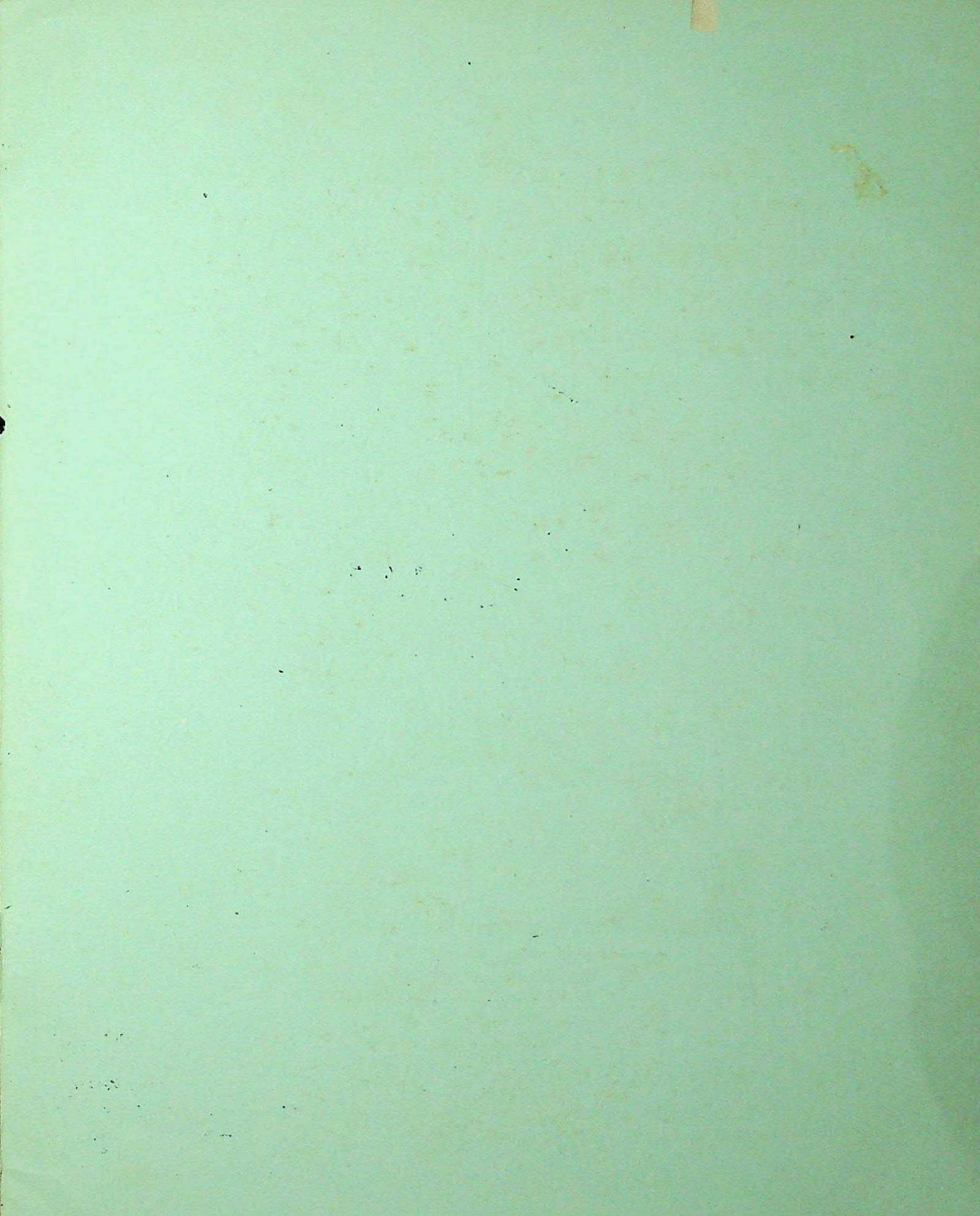
লাগলো। সোনার প্রতিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তিনি সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ঘুম আর ভাঙলো না।

রাজস্থানের 'শূল-কমলিনী' অকালে শুকিয়ে বা'রে প'ড়ে গেল। হুর্কুত আমীর খাঁ এবং অজিত সিংহের অভিলাষই পূর্ণ হ'লো।

রাজবাড়ী হাহাকারে ভ'রে উঠলো। কৃষ্ণার মা এ শোক আর সহ করতে পারলেন না। কয়েকদিন পরে তিনিও এ পৃথিবী ছেড়ে মেয়ে যে রাজ্যে গেছেন, সে রাজ্যে যাত্রা করলেন।

আর বৃদ্ধ রাণা ভীমসিংহ?—কন্য়ার শোকে তাঁর বুক ভেঙে পড়লো। তাঁর জীবনের আনন্দ, সংসারের সুখ, পৃথিবীর শান্তি চিরদিনের মত চ'লে গেল।





শুকতারা শিশু-মাসিক

ফাল্গুন পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ
 বার্ষিক মূল্য ৪. টাকা
 পারিষে গ্রাহক ইউন

দেব স্যাহাণ্য কৃষ্ণাব-কালিকাতা-৯

[শিশু-মাটক]

[শ্রী-ভূমিকা বজ্জিত]

বুড়িবালাঘের ভীরে	১১
সিরাঙ্কের স্বপ্ন	১৬/০
বীর মোহনলাল	১৬/০
স্বাধীনতা জাগলো	১১/০
বীর শিবাজী	১৬/০
জাগোরে বীরে	১৬/০
কেশব রায়	১৬/০

[শিশু উপন্যাস]

টার্জান দি এপ্যান	১১০
গল্পের মারাপুরী	২১
পরাজিত এভারেস্ট	১১০
বাঘের দেশে	১১
সন্ অব কণ্	১১০
অমানুষিক মানুষ	১১০
আবার ঘেঁষের খন	১১০
হিমালয়ের ভয়ঙ্কর	১১০
ঠাকুরমার ঝুলি	২১
হানা বাড়ী	১১০
মরণের ডাক	১১০
যুগিপাকে	১১০

বিশ্ব-পরিচয়

মূল্য
৮

(পৃথিবীর ইতিহাস)

দেব সাহিত্য মুদ্রণ
কলিকাতা-৯

